Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 122-130
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.055

ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের উপস্থাপনা: বিমল সিংহের 'লংতরাই'—একটি অধ্যয়ন

ড. সুজিত কুমার দাস, *গ্রাম রোজকার সেবক, পানিসাগর গ্রামীণ উন্নয়ন ব্লক, উত্তর ত্রিপুরা, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 06.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract
Bimal Singh is a distinguished literary figure in Tripura, known for his realistic portrayal of the lives of both hill and plain communities. In his stories and novels, he presents the social, cultural, and economic crises of Bengali and tribal societies from a deeply humanistic perspective. Born on October 16, 1948, in Rupaspur village, Kamalpur subdivision of hilly Tripura, into a cultured Bishnupriya Manipuri family, Singh grew up in a multilingual and multicultural environment, gaining intimate knowledge of the lifestyles and mentalities of various communities.
His involvement in student movements and later entry into political life through legal and journalistic education grounded his literary consciousness in reality. First-hand experiences of the joys, sorrows, exploitation, and struggles of ordinary people lend his literature a credible and lifelike quality. His works reflect the language, culture, and survival struggles of the Bishnupriya Manipuri, Bengali, Tripuri (Reang), and tea garden worker communities. Singh's curiosity about nature—plants, rivers, waterfalls, hills, and animals—is evident throughout his works. Through his stories, he fosters love, affection, and self-confidence among people, transcending caste, religion, and creed. His interactions with villagers and hill communities allowed him to understand the depth of relationships among uprooted, landless, and displaced people. Particularly, the post-partition coexistence, trust, and mutual support in Tripura's mixed Bengali-tribal culture are vividly reflected in his narratives, portraying the socio-political turbulence of the post-1980 period.
Keywords: Tribal Life, Tripura, Literature, Bimal Singh, Bengali Novels, Cultural Representation

বিচিত্র পাখীর গানে, বন্য জন্তর কলরবে, মানুষের হাসিকান্নায় আবেগে, দুঃখে ছড়ার কলকলানীতে কৃষ্ণনীল বর্ণের নিস্তব্ধতায় মুখরিত রহস্যময় 'লংতরাই' পাহাড়। জীবনবিশ্বাস, জীবনদর্শন, মতাদর্শ প্রত্যেক লেখকের ব্যক্তিসত্তা এবং সাহিত্যসৃষ্টিকে স্বতন্ত্রধর্মী করে তোলে। কথাসাহিত্যিক বিমল সিংহের ব্যক্তিজীবনও তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস 'লংতরাই' সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রাসঙ্গিক। বিমল সিংহ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সফলতা লাভ করেছিলেন অন্যদিকে তেমনি ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে তিনি প্রতিনিধি স্থানীয় একজন লেখক। তিনি ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী হিসেবে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন একটি রাজনৈতিক দলের এক অগ্রণী সেনানী হিসাবে। সুতরাং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিমল সিংহের এক নির্দিষ্ট পরিচয় আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য অঙ্গনে অনেক লেখক কবি আবির্ভাব জানান দিয়েছিলেন। বিমল সিংহ ছিলেন এই ধারারই একজন লেখক। তিনি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি তথা মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর 'লংতরাই' উপন্যাস রচনা

করেছেন। ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়ের অপরিচিত জীবনকাহিনী লেখক 'লংতরাই' উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। কাহিনী, চরিত্র চিত্রণ এবং নির্মাণ কৌশলে বিমলসিংহের 'লংতরাই' ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাসের অন্যতম সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

ত্রিপুরার সুবিশাল লংতরাই পাহাড়ের পাদদেশে শ্যামল ছায়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন জনজাতির বসবাস। লংতরাই পাহাড়ে উচু টিলার গায়ে বিস্তৃত জুমক্ষেত। পাহাড়ের ঢালুতে সাদা কার্পাসফুল বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আন্দোলিত হচ্ছে। কার্পাস ক্ষেতের উপরে ভাসছে তিলগাছের থোকা থোকা ফল, আর একবারে নীচু হয়ে জুমের লাল সবুজ, হলুদ রঙ ধরা মরিচ। টিলার নীচে পাহাড়ি জামা বিচিত্র রঙের বাহার। টিলার মাঝখানে অরহড় গাছ। উঁচু ডালগুলি বাতাসে নড়ছে। কোথাও আবার চিনার, কুমড়া, লতা থরে থরে। য়ংচরিং সকাল বিকাল বাজিয়ে যাচ্ছে তার ঘণ্টার মত ধ্বনি। য়ংচরিং একধরনের পতঙ্গ, গহন বনে থাকে। জুমিয়ারা জানে যংচরিং-এর ডাকের মানে, তিল কার্পাস ফোটার সময় হয়েছে। ঘরেঘরে 'য়ংচরিং' ধ্বনি, লংতরাই-এর পাদদেশে গলাছড়া গ্রামে রিয়াং জনপদের জীবন কাহিনী দিন-কৃত্য, আর্থ-সামাজিক জীবনসংস্কৃতি, জীবনবিশ্বাস, জীবনপ্রবহ মানবতার পরিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে বিমল সিংহের 'লংতরাই' উপন্যাস এক অন্যতম সাহিত্য সৃষ্টি। লেখক জনজাতির জীবনকাহিনী বিষয়ে যে জীবনঅভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তা রিয়াং জনজাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। "যাযাবরের মতো মানুষ পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছোটছে অনাদিকাল থেকে খাদ্য আহরণে। নদীর উপত্যকায়, পাহাড়ের ঢালুতে, কখনো নদীর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত উঁচু নীচু গহন বনভূমির বিচিত্র পশুপাখির কলরব মুখর পরিবেশে চলছে জন্মমৃত্যু উৎসব, বিপর্যয় সংসারের যত রকম খেলা।"[১] বস্তুত পাহাড়-ই আর সব উপজাতি সম্প্রদায়ের মতো রিয়াংদেরও বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। পাহার নদীর খামখেয়ালিপনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবন দোলায়িত হয় এবং পাহাড় নদীই তাদের কাছে সর্বস্ব। বিমল সিংহ তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন—"যে সব নদী পাহাড় পথে পথে কোলে নিয়ে বিয়াং সমাজকে লালন পালন করেছে, তারাই এখন দেবদেবী। মানুষ ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে জীবন শুরু হয় পাহাড় আর নদী বন্দনার গানে।"[২] এমনকি মৃত্যুর পরও পাহাড় নদীর রহস্যময় পরিবেশে তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। 'লংতরাই' উপন্যাস তাই হয়ে উঠেছে পাহাড় নদী কেন্দ্রিক রিয়াংদের জীবনকাহিনী তথা জীবনদর্শনের এক বিশেষ সৃষ্টি।

উপন্যাসের প্রথমেই লেখক জুমচাষ কেন্দ্রিক ত্রিপুরার পাহাড়ি জনজাতির জীবনযাত্রার মতো গলাছড়ার পাহাড়ি এলাকার জুমচাষে ব্যস্ত রিয়াং সম্প্রদায়ের লোকজনেরা। তাদের পরিশ্রমসিদ্ধ জুমচাষ পদ্ধতির উল্লেখের পাশাপাশি জুমচাষের ফসলের কথাও বর্ণনা করেছেন লেখক। চাষের শুরু থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন এই উপন্যাসে। এরই সাথে সাথে লেখক তাঁর সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয়ও দিয়েছেন। "কার্পাসের সাদা ওড়নার নীচে পাহাড়ী জমির, বিচিত্র রংয়ের বাহার, টিলার মাঝখানে অরহাড়, উচু ডালগুলি বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। কোথাও আবার চীনার, কুমড়া লতা থরে থরে।"[৩] যৌথ শ্রমেই চলে জুমচাষ। উপন্যাসে দুটি দলের জুমচাষের কথা বলা হয়েছে। এই দুটি দলের প্রধান চরিত্র জরকামুনি ও সাজেরুঙের জীবনাঙ্গিকে কাহিনী গড়ে উঠেছে। দিনের পর দিন চলছে জুমক্ষেতে চাষ। দুপুরবেলা রোদের তাপে তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। বিশ্রামের সময় চলে গল্পগুজব আনন্দফুর্তি। জুমের ক্ষেতে কাজ করতে করতে পরিশ্রান্ত জরকামুনি 'কুসুমল' (পাহাড়িয়া বাঁশি) বাজাতে বাজাতে আনন্দে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। কুসুমল-এর কোমল সুর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, ভেসে যায় দূরে এই কোমল সুর অভিভূত করে দেয় জুমের কাজে ব্যস্ত অন্য আরেকটি গাইরিং-এর (জুমের টংঘরে) বাসিন্দা সাজেরুঙকে। বাঁশীর সুর থামেনা। মেয়েটির হাতে রূপার বালা টুংটাং বাজে। দূর থেকে জরকামুনি শোনে না। তবে হাতের রূপার বালা রোদে ঝলকায়। জরকামুনির চোখ ধাঁধায়। অচেনা জুমিয়া কিশোরিকে দেখলে গান গেয়ে গেয়ে জিজ্ঞেসা করার রীতি রিয়াং সমাজে প্রচলিত।

জরকামুনি মাথায় গামছা বেঁধে বাঁশী রেখে আবার তিলক্ষেতে নেমে যায়। সারা দেহে কর্মতৎপরতা এসেছে। ভালবাসার সমস্ত তাড়না কর্মঠ হাতের পেশীতে সঞ্চারিত হয়। তিলগাছের শাখা বাঁধতে বাঁধতে গান গেয়ে উঠে জরকামুনি। রিয়াং সমাজের এই রীতিই চলে আসছে। গানের মধ্য দিয়েই প্রেমিক তার প্রেমিকাকে প্রণয়ের সব কথা মনখুলে জানায়। বহু বংশ পরম্পরায় এই রীতি চলছে ধারাবাহিক।

"বুকতই হাপুংনি তক বা ফাইজাকথা
তকনারই চকবুইমা, বুকতই তুইবুংনি
আ, বা ফাইজাকথা। বিষতং চালাই চালাই
নাইয় সে মুখচিনদা কইরেঙ মা।
(কোন পাহাড়ের পাখি তুমি
লেজ নাচিয়ে কেন তুমি এলে
কোন নদীর ঝাঁকহারা মাছ
কেন তুমি অচিন জুমে এলে
বাঁকা চোখের চাহনি দেখে চেনা চেনা লাগে।

মেয়েটিও জুমিয়া কথার ছলা কলা জানে। লোকগীতির কলি খুঁজে খুঁজে কিছুক্ষণ পর জবাব দেয় গানের সুরে।

হাপিং থাকলেঙ খাকনিলে কাইয়া
নুংবই মালায়নি ছকইয়া।
(অরহড় ক্ষেতের ফসল মাড়াতে আসিনি।
এসেছি তোমার জন্য।)"[৪]

এভাবে ধীরে ধীরে জরকামুনি সাজেরুঙের জীবনকাহিনী হয়ে উঠেছে 'লংতরাই' উপন্যাসের মূল আখ্যান বস্তু।

'লংতরাই' বড় মাপের উপন্যাস নয়। মাত্র ৭১ পৃষ্ঠার উপন্যাসটিতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কাহিনিধারা এগিয়ে চলছে। কাহিনির শুরুতে জুম চাষের কথা বলা হয়েছে। জুমের ফসল ঘরে উঠেছে তাই কয়েক মাস কাটে সুখ আনন্দে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে শুরু হয় জীবন সংগ্রামের আরেক ইতিহাস। এই সময়ে লংতরাই পাহাড় প্রাকৃতিক সম্পদ অপ্রতুল হয়ে পড়ে। লংতরাই পাহাড় পাখীর জগৎও বিচিত্র, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে আয়ুংমাই বন পতঙ্গের ডাকের মধ্যে পাহাড়ি লোকগুলি শুনতে পায় দুর্ভিক্ষের বার্তা। পাহাড়ী নদীর খাড়া পাড়ে চিচিং পাখির বাসা দেখে প্রকৃতি পাহাড়ী বাসি সবাই বুঝতে পারে এবার কতটা বৃষ্টি হবে। আয়ুংমাই বন পতঙ্গের ডাকে জরকামুনিও সাজেরুঙের মধ্যে দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক। অনাহারে দুর্বিসহ কষ্ট নীরবে সহ্য করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকে না। তবে তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে না। কঠোর পরিশ্রমে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। উপন্যাসটিতে দেখা যায় জরকামুনি ও তার বাবা রংকারায় বর্ডার রোড সংস্থার অধীনে আসাম-আগরতলা সড়ক মেরামতির কাজে লেগে যায়। কিন্তু নানা কারণে সেই কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। শেষ ভরসা লংতরাই পাহাড়— "অফুরন্ত সম্পদে বাঁশ, কাঠ, পাথর থরে থরে সাজিয়ে বসে আছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য পসরা-খুলে যারা দেখে শুনে চিনে জেনে আনতে পারে তারাই বাঁচে।"[৫] 'লংতরাই' উপন্যাসে লেখক গলাছড়া গ্রামের রিয়াং জনপদের দুর্ভিক্ষ পীড়িত দিনগুলি এবং বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টার মধ্যে দিয়ে সমগ্র উপজাতি জনপদের কথাই বলেছেন। বেঁচে থাকার জন্য নিদারুণ কাহিনীর বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন— "ভাতের স্বাদ একমাত্র কুঙ্গা নামক আলু দিয়ে মেটানো হয়। কাটাকাটা কচুলতের গোটা মাটিতে লুকানো থাকে। লংতরাই পাহাড় যেন সযত্নে উম দিয়ে রেখেছে, ক্ষুধার্ত জুমিয়াদের নিদান দিনের সম্বল করে।"[৬]

লংতরাই পাহাড়ের প্রাকৃতিক সম্পদের ফুরিয়ে যাওয়ার ফলে তাদের যে নিদারুণ দিনের যে অভাব-অনটন সেই দিকের প্রতিচ্ছবিও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তারা পাহাড়ের ছন, বন, কাঠ, লাকড়ি কেটে তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনধারনের জন্য বেঁচে থাকার লড়াই শুরু করে। কিন্তু সেখানেও এল বনদপ্তরের নানা বাধা নিষেধ বন বাবুরা তাদের ফরমান জারি করে জুম থেকে ছন, বন, বাঁশ, লাকড়ি কাটা নিষেধ করে দিল। ফলে তাদের জীবন আরও সঙ্কটাপন্ন হল। আদিবাসীদের এই দুর্দিনের বান্ধব হিসাবে দেখা দেয় সুদখোর মহাজন, ঠকবাজ শ্রেনির লোকের আবির্ভাব হল। যেমন— মাখন বাবু, চৈতন্য বাবু, প্রমোদ বাবু, কানাই বাবু, আরও কতকি বাবুদের উপস্থিতি উপন্যসে উল্লেখ করেছেন লেখক। লেখক বাস্তব অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে আমবাসা বাজাবের সুদখোর ইত্যাদি মহাজন বাবুদের যে চরিত্র অঙ্কন করেছেন তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক হয়ে উঠেছে। আদিবাসী জন-জীবনের বাস্তব শোষণ-বঞ্চনা নির্মম হয়ে উঠে জুমের ফসল আমবাসা বাজারে এনে বিক্রি করার দৃশ্যে। যখন জুমের ফসল বাজারে তখন দামও তর তর করে নেমে যায়। লেখক এই দরদি মানসিকতায় জুমিয়াদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন। নিদান দিনের আহার-অর্ধাহার, কঠোর পরিশ্রম, দারিদ্র-তবু জন্ম, বিবাহ অনুষ্ঠান থেমে থাকে না। আশ্বিনের শেষে ঋণ শোধ করেও ঘরে কিছু ফসল আছে— এখন আনন্দের দিন। এই সময় জরকামুনির বাবা রংকারায় ছেলের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। তেতেয়া গ্রামের উচু পাহাড়ের ওপারে খোয়াই নদীর পূর্বে খমুপাড়ার কৌরেঙফার মেয়ে সাজেরুঙের সঙ্গে জরকামুনির বিয়ে হল। জুমখেতের জরকামুনি ও সাজেরুঙের মধ্যে যে পূর্বরাগের প্রেম-ভালোবাসা সঞ্চারিত ও গভীর হয়ে উঠেছিল তাদের বিবাহের মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণতা লাভ করল। রিয়াং সমাজের রীতি অনুযায়ী জরকামুনিকে খুমপাড়ায় থাকতে হল। এই পর্বে রিয়াংদের বিয়ের অনুষ্ঠানের বর্ণনায় তাদের পরম্পরাগত সংস্কৃতি চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। জরকামুনি ও সাজেরুঙের বিয়েতে পালনীয় সংস্কারের বা আচরনের বর্ণনাটি এরকম: "পাটি বিছানো হয় ঘরের ভেতরে, মাঝখানে। পাটির উপর নতুন কাপড় পেতে দেওয়া হয়। কাছে একটা ডালায় চাল, কার্পাস, মরিচ, পাথর, তিল, লবন, ঘরে থাকে এবং একটা লম্বা লোহা। পাগড়ি বাঁধা যুবকরা কুসুমুল, চঙপ্রেঙ বাজিয়ে বর আনতে যায় পাশের বাড়ী থেকে। বরের ডান দিকে একটা বক্ষ আবরনী থাকে। রিয়াংদের বিয়েতে কনে থাকেনা, কনের প্রতিনিধিত্ব ওই বক্ষ আবরনী। বর জরকামুনি দেখতে পাওয়া যায় কনের ঘরের মাঝখানে এসে বসেছে।"[৭] একটি সংগীতপূর্ণ মুহূর্ত এই সময় বিয়ের কতগুলি পর্যায় রয়েছে।

প্রথমত: অচাই (অনুষ্ঠানের পুরোহিত) ডালা থেকে একমুঠো চাল নিয়ে বলে, জরকামুনি ও সাজেরঙের বিয়েতে সবার সম্মতি আছে কিনা সম্মতি জানিয়ে হাত তালি দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।

দ্বিতীয়: অচাই বলে 'চাল থেকে ভাত হয়' এই ভাতই আমাদের প্রাণ-রস। অচাই প্রতিজ্ঞা করায় চালকে সাক্ষী রেখে যে, জরাকামুনি ও সাজেরুঙ একে অপরের আত্মীয় পরিজনকে শ্রদ্ধা করবে ও ভালবাসবে।

তৃতীয়: অচাই এরপর তিল ধরে শপথ করায়, তিলের তেল যেমন কর্কষ জিনিসকেও কোমল করে তেমনি ভালবাসা দিয়ে রাগ, ক্রোধ সব শান্ত করবে। সবাই এতে সন্মতি জানায়।

চতুর্থত: অচাই রিসার উপর একটি মরিচ রেখে বলে স্বামী-স্ত্রী যেন একে অপরের দুঃখে জ্বালাগ্রস্থ হন। মরিচ গায়ে লাগলে যেমন হয়।

পঞ্চমত: এবার লবন মুখে দিয়ে বলে 'লবন ছাড়া যেমন কোন রান্না স্বাদ হয়না লবন থাকতেই হবে সব রান্নাতে। লবনের মতো স্বামী-স্ত্রীকেও প্রতিকাজে সুখেদুঃখে একসঙ্গে থেকে একে অপরের লবনের মতোই হবে।

ষষ্টত: অচাই এরপর বলে নদী যেমন দীর্ঘ হয় নদীর জলের ওজন যেমন কেউ মাপতে পারেনা স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসাও তেমনি ওজন করা বা মাপা যায়না।

সপ্তমত: জরকামুনি ও সাজেরুঙ-এর বিয়ে আন্দ্রেদের সম্মতিতে সমাপ্ত হয়। বিয়ের শেষে শুয়োর কাটা হয়। এইভাবে রিয়াংস মাজে বিয়ের আচার অনুষ্ঠানপর্ব-সমাপ্ত হয়। তাদের রীতিনীতি আমাদের মুগ্ধ করে।

রিয়াং সমাজ ব্যবস্থায় শুধু নয়, সমগ্র আধিবাসী সমাজে বিয়ে সংক্রান্ত বিশেষ একটি নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। সেটি হল— 'জামাইখাটা' প্রথা, বিয়ের পর তিন বছর জামাই কে শ্বশুরবাড়ীতে থেকে নিজের যোগ্যতার প্রমান দিতে হয়। বিশেষত আদিবাসী সভ্যতা হল মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতা, তাই বরকে কনের বাড়ী থাকতে হত। জরকামুনি শ্বশুরবাড়ীতে ধান কাটে, ছনকাঠে, সাজেরুঙের বাবার হুকোতে জল পাল্টিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এই উপন্যাসে লেখক কিছু আদিবাসী প্রবাদের মাধ্যমে সমাজ জীবন অভিজ্ঞতার অনবদ্য লোক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। যা রিয়াং উপজাতি সমাজেও রয়েছে—

ক) 'শ্বশুরবাড়ী স্বর্গপুরী তিনদিন হলে ঝাড়ুরবাড়ী'

খ) 'এক খড়মের খুটিগেলে কত খড়মের খুটি'

গ) 'ঘোড়া দেখে সব খোঁড়া হয়ে গেছে'

ঘ) 'খেতে নাচাইলে ভাত ভালো না থাকতে না চাইলে ঘর খারাপ', ইত্যাদি বাস্তব অভিজ্ঞতার অনবদ্য লোক উপাদান হিসাবে চিহ্নিত। লোকনৃত্য ও লোকগীতির অনবদ্য সুর আদিবাসী সমাজেও বিদ্যমান। সাজেরুঙ ও জরকামুনির মধ্যে নাচ-গানের এক বিশেষ উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। বাদল বাজিয়ে যে গানের কথা শুরু হয়, সেটি এইরকম:

"তা ক্রিদি তা লাচিদি
য়াক তা কলইদি।
বাচাকল সাদি
খামতাং ইয়াক মাইয়
সুমুল সু ইরাফ মাইয়
আনি চামারই কুইনাইহা।
(হাটু আর গোরালী
না কাঁপিয়ে দাঁড়িয়ে নাচ।
বাঁশী ছাড়া ঢোল ছাড়া
নাচন ধরে সোহাগী জামাই।)" [৮]

কোমর দুলিয়ে, ঘাড় বাকিয়ে আঙুলে ঢেউ তুলে জরকামুনি নাচে। ঘুরে ঘুরে নাচে। আস্তে আস্তে সাজেরুঙও নাচতে যায়। বুড়ো-বুড়ি সবাই গান ধরে:

"গং গং গং
খমু কতর মা
সাইচুং তা থাংদি
গংবাই ওয়ায় য়াকনা
পাড়া কতর মা
সাইচুং তা থাংদি
সুই বাই ওয়াই যাক না
কাতি হাবালাং
নুংব থাংখে আংব তংখে

পান্ত সাই লাং লাং।
(ভালুক ভালুক ভালুক
গভীর বনে একা
যেয়ো না।
বন্য ভালুক ধরে খাবে
বড় পাড়ায় একা
যেয়োনা কুকুর কামড় দেবে
ঘাটে যেমন নিঃসঙ্গ
চাপিলা মাছ থাকে
তুমি গেলে তেমনি জ্বলব ব্যথায়।)"[৯]

আদিবাসী মানুষগুলো পৃথিবী থেকে অনেকদূরে স্বপ্নের নাচে বিভোর। সামাজ পরিকাঠামোতে লোক সমাজ অনেকটাই অনগ্রসর। এখানে প্রাচীন প্রথা প্রায় বিলুপ্তির পথে। অন্যদিকে আদিবাসী সমাজে এ সকল প্রথা বর্তমানেও প্রচলিত। লোকৈতিহ্য বিশেষ লোকসংস্কৃতির কোন সুনির্দিষ্ট লিখিত শাস্ত্র নেই। উদ্ভাবনী শক্তির সামর্থ্যে ভরপুর অদিবাসী সমাজে প্রাচীন প্রথা পদ্ধতি, বিশ্বাস, ইত্যাদি একরকম থাকার জন্য উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রায় নেই। অদিবাসী সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতির ঠিক বিপরীত। সভ্যতার স্রোতে লোকসংস্কৃতি চিরনবীন। অন্যদিকে অদিবাসী সংস্কৃতির বিষয়-ভাবনা স্থিতিশীল।

আলোচ্য বৈশিষ্ট্য গুলির আলোকে বিমল সিংহের লেখা 'লংতরাই' উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। 'লংতরাই' সম্পর্কে লেখক বলেছেন: "বিচিত্র পাখীর গানে বন্য জন্তর কলেররে, মানুষের হাসি-কান্নায় আবেগে, দুঃখে, ছড়ার কল-কলানীতে কৃষ্ণনীল বর্ণের নিস্তব্ধতায় মুখরিত রহস্যময় লংতরাই পাহাড়। সেই জীবন থেকে অচাই তালবাংহা কয়েকফোটা তেতো, মিঠা, কোনটা চোখের জলের মতো নোনতা মধু দিয়ে সাহায্য করেছেন"[১০]

কালের ঘূর্ণিপাকে লংতরাই পাহাড়ের জীবনকাহিনীও ঘঠনাবলী অপরিবর্তিত রয়েছে বরাবর। জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে আবারো এসেছে তাদের স্বরূপ নিয়ে। দুর্দশা দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র প্রতি বছরের ঘটনা হলেও জরকামুনির এবারকার ঘটনা জটিল হয়ে উঠে। ক্ষুধা নিবারণের জন্য মুরুগী শুকর ইত্যাদি শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করতে হয়েছে। সম্বল করার আর কিছু নেই। কিন্তু সামনেই সাজেরুঙের প্রসবের দিন, হাতে কিছু টাকা চাই। যার ফলস্বরূপ সাজেরুঙের গলার কাঁচা টাকার মালা বন্ধক দিয়ে টাকা যোগার হল। টাকার মালা বন্ধক দেবার বিষয়টাকে স্মরনীয় করে রাখা হল তাদের ছেলের নামকরনণের মধ্য দিয়ে। জরকামুনিও সাজেরুঙের ছেলের নাম রাখা হল 'রাংথাংহা' অর্থাৎ শিশুর জন্ম হয়েছে ওর ঠাকুরমার রূপোর মালা বন্ধক দেওয়ার পর। শিশুর জন্মের পর তাদের জীবনে এসেছে আনন্দ জোয়ার। হাজার বছরের পুরানো গানগেয়ে সাজেরুঙ ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে— "না ঘুমিয়ে থাকেনা/বুনো বিরাল/কামড় দিয়োনা।"[১১] সাজেরুঙের মুখে আমরা ছড়া ধর্মী ঘুমাপাড়ানীর গান শুনতে পাই। দোলনায় দোলাতে দোলাতে হাজার বছরের ঐতিহ্য আমাদের কর্ণগোচর হয়। এখানে এই গানের কয়েকটি পঙক্তি তুলে ধরা হল— "আমার খোকা/না ঘুমিয়ে থাকেনা/বনচিল আর এসোনা/খোকা আমার --/না ঘুমিয়ে থাকেনা।"[১২] এই ঘুমপাড়ানোর সুর যেন চিরন্তন লোকসাহিত্যের বার্তাকে বহন করে। আদিবাসী সমাজের নবজাতকের জন্মের পর কিছু লোকাচার পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

ক) গর্ভাবস্থায় মা যদি আদা-হলুদ চুরি করে, তাহলে শিশুর পায়ের আঙুল বা কোন অঙ্গবাড়ে। এতে প্রসবে কষ্ট বাড়ায়।

খ) সাজেরুঙ যখন সন্তান সম্ভবা হয়, তখন দেখা যায়, তলবাংহা নদীর পূজা দেওয়া। মোরগ কেটে মন্ত্র পরে। মোরগের নাড়ি দেখে গভিনীর যন্ত্রণার কারণ বোঝা যায়।

গ) অদিবাসী সংস্কার অনুযায়ী সন্তান সন্ধায় জন্ম হলে, তার আয়ু কম হয়। উপন্যাসে সংস্কার ও বিশ্বাসের দিকটি দেখা যায়।

ঘ) অদিবাসী সমাজে 'কুমায়ুক' অর্থাৎ ধাই। নাভী কাটা হয় ধারালো বাঁশের দ্বারা।

ঙ) এরপর দেখা যায়, তালবাংহা সাজেরুঙের খোপায় একটু করে হলুদ ও ঝাড়ুর শলা ভেঙ্গে গুজে দেয়। তা নাহলে বুড়াসা দেবতার নজর এড়ানো যাবেনা, আর নানা কু-প্রভাব হতে পারে।

চ) তালবাংহার ভবিষ্যৎবাণী ভুল প্রমাণিত হয়। ছেলে জন্ম হয় সাজেরুঙের। এই কথা ছাড়া তালবাংহার বাকি সব কথা ফলে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তালবাংহা দেবতার উদ্দেশ্যে এক কলস মদ দিয়ে ক্ষমা চায়।

ছ) শিশুর নামকরণ কি হবে, এ দায়িত্ব সমাজে কুমায়ুকের (ধাই) ওপর দেওয়া হয়। নামকরণ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর 'বেইবুনামা' অনুষ্ঠান হয়। নবজাতকের জন্য পৃথিবীর সকল দেবতার কাছে প্রার্থনা জানানো হয়। মানুষ জন্মের পর নদী ও পাহাড় বন্ধনা গান গাওয়া হয়। মঙ্গলশঙ্খের সাথে উচ্চারিত হয় পবিত্র লোকমন্ত্র। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে ভোজের আয়োজন করা হয়।

কিন্তু আনন্দময় পরিবেশ স্থায়ী হয়না জুমিয়া আদিবাসী জীবনে। সেই বছর খমুপাড়ায় দেখা দিল মহামারি। এই আনন্দের বার্তা প্রতিধ্বনিত হওয়ার পরওই রিয়াং পাড়ায় মৃত্যুর বার্তা বয়ে আসে। উপন্যাসে দেখতে পাই সাজেরুঙের কাছে খবর আসে জরকামুনির বন্ধু বিশ্বরাম মারা গেছে। বিশ্বরাম মারা গেছে দাস্তবমিতে। জরকামুনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এদের সমাজে মৃত্যু সংক্রান্ত আচার পালনের বিশেষ নিয়ম রয়েছে। যেমন:

ক) বিয়াং সমাজে কেউ মারা গেলে সারারাত ধরে ঢোল, বাঁশি বাজানো তাদের রীতি।

"কেকাতা দাং দাং
কেকাতা দাং দাং
দাইন দাং চুলুক
দাইন দাং চুলুক
কেকাতা দাং দাং
কেকাতা দাং দাং" [১৩]

এর অর্থ হচ্ছে মারা যাওয়ার খবর জানান দেওয়া রীতি।

খ) বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খবর আসে সবার কাছে। ধ্বনিত হয় 'তক্খুমা তাউক! তক্খুমা তাউক'! এর অর্থ হল মৃত দেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আদেশ।

গ) শ্মশানে স্তরে স্তরে লাকড়ি সাজানো হয়, স্তর স্তর লাকড়ির উপর শব দেহ রাখা হয়। শবদেহ ঢাকা হয় নতুন কাপড়ের দ্বারা।

ঘ) মৃতের আত্মীয় কে দেখা যায়, পথে পথে আসতে আসতে তিল-কার্পাস মুঠো মুঠো ছিটায় আর নদী বা ছড়া পার হওয়ার সময় সুতা ছিড়ে ছিড়ে ছড়ায়।

৫) জরকামুনিকে দেখা যায়, সাদা মার্গিন কাপড়ের পতাকা ছড়িয়ে শবদেহের মিছিলে। সে পতাকাটি শ্মশানের মাটিতে পুতে দেওয়া হয়।

চ) লোকাচারের পরবর্তী পর্যায় হিসাবে যুবকদের দেখা যায় সিমালুংনক (শশ্মশানঘর)

বানাতে। রিয়াংদের বিশ্বাস মৃতের প্রাণ সেখানে বিশ্রাম করে। আত্মা সম্পর্কে বিশ্বাস আদিবাসী সমাজে প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান।

ছ) মৃতদেহ সংস্কারের পর, (দাহ করা হয়) জল ঢেলে চিতাভস্ম ঠান্ডা করা হয়। 'সিমালুংনক'-এ মৃতের অস্থি ঝুলিয়ে রাখা হয়। এখানে মৃতের উদ্দেশ্যে সপ্তাহে একবার জল ও পাতায় ভাত দেওয়ার রীতি প্রচলিত। এখানে মৃত্যু পাগলা নেকড়ের মতো প্রতি রাত্রে হানা দেয়। তার থাবায় হারিয়ে গেল সাজেরুঙের বাবা ফৌরেংফার জীবন।

আদিবাসী রিয়াং সমাজে নানা লোককাহিনী প্রচলিত রয়েছে। আদিবাসীরা লাউতাউ দেবতার পূজা করত, রিয়াং সমাজের বিশ্বাস: "লাউতাউ দেবতা মৃত্যুকে ঠেকানোর সংগ্রাম করে। মানুষের প্রাণ বাঁচাতে গিয়েই নিজের দেহ উৎসর্গ করে ছিল লাউতাউ।"[১৪] উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে— "অনেক অনেক আগে পৃথিবীতে নাকি চারজন বিখ্যাত অচাই বা পুবহিত ছিল। তারা হলো অচাই-লিককাই অর্থাৎ, গুণজানা অমঙ্গলকারী। অচাই সুনথা বা কুৎসিত, অচাই লুনথা বা আঙ্গুলঝরা বিকলাঙ্গ ও অচাই নাপুকে বা পরোপকারী কেউ বিশ্বাস করে ওরাই হলো যুগে যুগে বনদেবতা বুড়াসার বিভিন্ন অবতার।"[১৫]

বিমল সিংহের 'লংতরাই' উপন্যাসে জরকামুনি-সাজেরুঙ-এর জীবনাঙ্গিকে বিয়াং সম্প্রদায়ের কথা বলা হলেও এর কাহিনী হয়ে উঠেছে লংতরাই পাহাড়ের পাদদেশে সব উপজাতি জনপদের। উপন্যাসটির নায়ক-নায়িকা জরকামুনি-সাজেরুঙ এবং এর প্রধান চরিত্র হল লংতরাই পাহাড়। বিমল সিংহ বিচিত্র পটনির্মাণের মধ্য দিয়ে কাহিনির অবয়ব তৈরী করেছেন। জুমচাষ, জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, সাংস্কৃতিক, পরলৌকিক, জীবনবিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি, দুর্ভিক্ষ দিনগুলির ভয়াবহতা, নতুন জীবন ভাবনা ইত্যাদি বিচিত্র পটকাহিনি নির্মাণ করেছেন এবং পটভূমিতে রয়েছে লংতরাই পাহাড়। লংতরাই পাহাড়ের গুরুত্ব ও প্রাধান্য নামকরণেই স্বীকৃতি পেয়েছে। কাহিনীর শেষাংশে উপজাতি জনজীবনে যে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তাতেও কিন্তু পট ও পটভূমিতে রয়েছে লংতরাই পাহাড়। 'লংতরাই'-এর পটভূমিতে রূপায়িত হয়েছে জাতি-উপজাতির জীবনসমস্যা, পরস্পরের বিশ্বাস, জীবন সংঘাত, আতঙ্ক, আনন্দ ইত্যাদি। 'লংতরাই' উপন্যাসে জনজাতির জীবনকাহিনিই 'লংতরাই' উপন্যাসের একম্অদ্বিতীয়া এখানেই 'লংতরাই' উপন্যাসের বিশিষ্টতা। লেখক জনজাতির জীবন কাহিনিকে কালের বিস্তৃতি থেকে অনাগত ভবিষ্যতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। লেখক বিমলসিংহের 'লংতরাই' উপন্যাস জনজাতিগোষ্ঠীর পরিচয় রূপায়নে এক অনন্য সৃষ্টি।

তথ্যসূত্র:

১) বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ। ত্রিপুরা দর্পণ। আগরতলা, প্রকাশ কাল ১৯৯৯, পৃ: ২১৯।
২) তদেব, পৃ: ২১৯
৩) সিংহ, বিমল। লংতরাই। নবচন্দনা প্রকাশনী, প্রকাশ কাল ১৯৮৪, পৃ: ১।
৪) বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ। ত্রিপুরা দর্পণ। আগরতলা, প্রকাশ কাল ১৯৯৯, পৃ: ১৭১।
৫) তদেব, পৃ: ১৮৪।
৬) তদেব, পৃ: ১৮৫।
৭) তদেব, পৃ: ২০৪।
৮) তদেব, পৃ: ২১৫।
৯) তদেব, পৃ: ২১৫।
১০) সিংহ, বিমল। লংতরাই। নবচন্দনা প্রকাশনী, প্রকাশ কাল ১৯৮৪, পৃ: ১।

১১) বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ। ত্রিপুরা দর্পণ। আগরতলা, প্রকাশ কাল ১৯৯৯, পৃ: ২২২।

১২) সিংহ, বিমল। লংতরাই। নবচন্দনা প্রকাশনী, প্রকাশ কাল ১৯৮৪, পৃ: ১২।

১৩) বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ। ত্রিপুরা দর্পণ। আগরতলা, প্রকাশ কাল ১৯৯৯, পৃ: ২২৩।

১৪) তদেব, পৃ: ২২৫-২৬।

১৫) তদেব, পৃ: ২২৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) সিংহ, শিশির কুমার। বিমল সিংহএর গল্প উপন্যাস কথাসাহিত্যে নতুন দিগন্ত। নবচন্দনা প্রকাশনী, আগরতলা, প্রকাশ কাল ২০১৩,

২) সিংহ, বিমল। লংতরাই। নবচন্দনা প্রকাশনী, আগরতলা, প্রকাশ কাল ১৯৮৪

৩) গুপ্ত, পূর্ণেন্দু। স্মরণে শ্রদ্ধায় বিমল সিংহ। নবচন্দনা প্রকাশনী, আগরতলা, প্রকাশ কাল ২০০৮

৪) সিংহ, শিশির কুমার। বসু, সুনৃতা। ত্রিপুরার বাংলা ও ককবরক উপন্যাসে আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি। নবচন্দনা প্রকাশনী, আগরতলা, প্রকাশ কাল ২০১৪

৫) দাস, সাধন। ত্রিপুরার আখ্যানে লংতরাই। নবচন্দনা প্রকাশনী, আগরতলা, প্রকাশ কাল ২০১২

৬) ভট্টাচার্য, কল্যানী। লংতরা ইকুইন। মানবী প্রকাশনী, আগরতলা, প্রকাশ কাল ২০০৩